নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৩)

পার্থিব মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর

'একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব শোরগোল উঠিয়াছে, ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে! কেউ বলিল, ঘোর কলি! কেউ বলিল, সব একাকার হয়ে যাবে! কেউ বলিল, জাতজন্ম আর থাকবে না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কেড়ে খেয়েছে? মা বললেন, জানিসনি? বিদ্যাসাগর।'— লিখেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জাত-ধর্ম-ছোঁয়াছুঁয়ি কিছুই মানতেন না বিদ্যাসাগর। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-মুসলমান-সাঁওতাল ইত্যাদিতে কোনও ফারাক ছিল না। সকলের সঙ্গেই তিনি অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন এবং অদ্ভুত ভাবে একান্ত আপনজন হয়ে যেতেন। প্রচলিত কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিদ্যাসাগর মানতেন না। কোনও শাস্ত্রীয় ধর্মমতের সাথে তাঁর কোনও রকম সংস্রব ছিল না। সেই সময়ে এ কাজ নিতান্ত অভাবনীয় এবং অত্যন্ত কঠিন ছিল। গোটা সমাজ জুড়ে তখন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ছিল মারাত্মক। কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, ছোঁয়াছুঁয়ি, ধর্মীয় গোঁড়ামি গোটা সমাজকে ছেয়ে ছিল। শাস্ত্রীয় যাঁতাকলে মানুষের জীবন পিষ্ট হচ্ছিল। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে বিদ্যাসাগর পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রায় একক প্রতিভায় এর বিরুদ্ধে মহান এবং দুর্ধর্ষ লড়াই চালিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে বলা হয় ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ। বলা বাহুল্য, ভারতীয় নবজাগরণ ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাবেই ঘটেছে। ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল পনেরো-ষোলো শতকে। এই নবজাগরণ তথা মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঈশ্বর ধারণা এবং চার্চের বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে এবং 'যা যুক্তিহীন, যা প্রমাণসাপেক্ষ নয় তা-ই বর্জনীয়'— এই বিচারধারাকে ভিত্তি করে। তা ছিল ধর্ম থেকে পুরোপুরি মুক্ত— সেকুলার। তার মূল কথা ছিল মানুষ। তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। মানুষের মূল্যবোধের জয়গান সে গেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত সামাজিক যে মূল্যবোধের ধারণা মানুষকে পরিচালিত করেছে, তার মূল কথা ছিল— মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি। কাজেই মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারবে, ঈশ্বরের কাছে যেতে পারবে। এই মূল্যবোধের দ্বারাই মানুষের মূল্যবোধ পরিচালিত হয়েছে। এ হল সাধারণ মানবিকতা। কিন্তু মানবতাবাদ যে মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তা মূলত সেকুলার, যার ভিত্তি হল অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতি। তার মূল কথা হচ্ছে মানুষই সত্য, মানুষ সবার ওপরে।

উনিশ শতকের ভারতে যাঁরা ইউরোপীয় নবজাগরণের তথা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান রামমোহন রায়। কিন্তু তিনি ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। ধর্মীয় মূল্যবোধকে তিনি বাদ দেননি। তাঁর সংগ্রাম ছিল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। তিনি বেদান্ত দর্শনের চর্চা করেছেন। কিন্তু ইহলোকের স্বীকৃতির প্রশ্নে তিনি শঙ্করপন্থী ছিলেন না। শঙ্করাচার্যের মতো তিনি বলেননি, জগৎ মিথ্যা। ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমাজ এবং মানুষের বিকাশের স্বার্থে ঢেলে সাজানোর জন্য ধর্মীয় সংস্কার সাধন, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এ দেশে নবজাগরণ আন্দোলনের জন্ম দেন। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বেদান্তকেই ভ্রান্ত দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করলেন। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর— ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এটাই হল ছেদ, গুণগত উত্তরণ।

বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনে সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষার প্রসার আন্দোলনে নেমে দেখেছেন, যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা ধর্মীয় বিধি, আচার, আড়ম্বর মানুষের মনকে জড়, অনড়, গতিহীন এবং মৃতপ্রায় করে তুলেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার মানুষের মনকে ছেয়ে রয়েছে। নতুন কোনও কিছু ভাবতে তারা ভয় পায়। দেখেছেন ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কী মারাত্মক ভাবে গোটা সমাজ জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার এবং নবজাগরণের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। স্পষ্ট দেখতে পান, ভারতের মানুষ যখন গোঁড়ামি অশিক্ষা অন্ধতা নিয়ে সুদূর অতীতের অন্ধকারে পড়ে রয়েছে তখন পাশ্চাত্যের মানুষ আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদকে হাতিয়ার করে মনুষ্যত্বের সাধনায় কীভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি উপলব্ধি করেন, এ দেশের সাধারণ মানুষকে যদি যথার্থ মানুষের মর্যাদায় তুলে আনতে হয় তবে তাদের মনের অন্ধকার দূর করতেই হবে। সে জন্য আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে, তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তুলতে হবে। না হলে এই সমাজের মুক্তি নেই। দেশীয় শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসাই তাদের কল্যাণে সারা জীবন কাজ করে যেতে তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করার একাগ্রতায় তাঁকে এই সত্যে পৌঁছে দিয়েছিল যে, প্রাচীন ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে আজ আর সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী চিন্তা। এ ব্যাপারে তিনি সেকুলার মানবতাবাদী চিন্তাকেই পাথেয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর ধর্মীয় ভাবধারা থেকে মুক্ত যুক্তি, পরীক্ষিত সত্য এবং বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই চলতে চেষ্টা করেছেন, দেখাতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃত সত্তা আছে কি নেই, সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রচেষ্টার খুব একটা প্রয়োজন নেই। মানুষই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে মুখ্য। তাই তাঁর একটি বক্তব্য খুব প্রচলিত রয়েছে, 'চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি-জরা-মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান-ভগবান করবে— এমন ভগবৎপ্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না। বার বার যেন ফিরে আসি এই বাংলায়'।

বিদ্যাসাগরের চিন্তায় এই বলিষ্ঠ সেকুলার মানবতাবাদের প্রভাবের জন্যই রামকৃষ্ণ সে যুগের বহু শিক্ষিত যুক্তিবাদী বলে পরিচিত মানুষকে প্রভাবিত করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করতে পারেননি। ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি ও পরকাল নিয়ে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ তিনি প্রায়শই করতেন। একবার কলকাতার সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পিতা চাঁদমোহন মৈত্রকে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসু। বাদুড়বাগানের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও শশিবাবু বিদ্যাসাগরের বাড়িটা ঠিকমতো চিনতে না পেরে খানিক ঘুরে হয়রান হয়েছিলেন। পরে বাড়ি খুঁজে পেলে বিদ্যাসাগর শশিভূষণকে বলেন, "ওই বাড়িতে বাস করে তুমি এই বৃদ্ধকে আমার বাড়িতে আনতে এত বেগ দিয়েছ! তবে তুমি কী করে মানুষকে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ? এখান থেকে এখানে, যখন তোমার এত গোলযোগ, তুমি সেই অজানা পথে কেমন করে লোক চালান দাও। আমি বুঝেছি, ও ব্যবসা তুমি এখনই ত্যাগ কর। ও তোমার কর্ম নয়। যার জানা পথে এত গোল, সে অজানা পথে না জানি লোকের কত দুর্দশাই করে থাকে।" পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "আমি দর্শন পড়েছি। কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়। কিছুই ভাল করে বোঝা যায় না। পণ্ডিত মশায় পড়ানোর সময় যখন জিজ্ঞাসা করতেন, ঈশ্বর বোঝো তো? আমি বলতাম, আপনিও যেমন বোঝেন, আমিও তেমন বুঝি। পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।"

ধর্মের আচার-আচরণের দিকেই শুধু নয়, ধর্মের মূল বক্তব্যের উপরও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, "দুইজন ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছু ঠিকানা নাই। আপনি ভিন্ন এ বিষয়েরও মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এ কথায় দাদা বলিলেন, "ধর্ম যে কী, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনও প্রয়োজন নাই। ... আমার বোধ হয় যে, পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ এ তর্ক থাকিবে। কস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবে না।"

বিদ্যাসাগর যাতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন সেজন্য তাঁর পরিবারের সদস্যরা চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন বিচার করলে দেখা যাবে, তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট— 'ধর্ম জিনিসটা না হলেও চলবে'।

সে-সময় ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের অনেকেই সংস্কারমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, আদালতে ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ নিতে বলিষ্ঠ ভাবে অস্বীকারও করেছেন। কিন্তু তাঁরা এর সামাজিক ভিত্তিটি ধরতে পারেননি। তাই তাঁরা সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে ভাঙতে গিয়ে কিছু কিছু উগ্র আচরণ করে ফেলেছেন। ফলে, সমাজমননে তেমন কোনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হননি। বিদ্যাসাগর চিন্তায় এবং মননের দিক থেকে ছিলেন প্রখর বাস্তববাদী এবং আধুনিক। তাই তাঁর আচরণে কখনও কোনও উগ্রতা স্থান পায়নি। তাঁর চিন্তা এবং কাজের শেকড় ছিল সমাজের অনেক গভীরে। তাই সমাজপতিরা অনেক চেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র করেও তাঁকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, তাঁর জ্ঞানচর্চা কোনও ভাবেই নিছক পাণ্ডিত্যের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না। ফলে, তিনি আধুনিক চিন্তা-চেতনার নির্যাস আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

নবজাগরণের যুগের আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের কাছে সত্য মানে ইহজগতের সত্য এবং তিনি মনে করতেন, একই বিষয়ে সত্য বহু হতে পারে না। কাশীর সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জে আর ব্যালেন্টাইন সুপারিশ করেছিলেন, ছাত্রদের পরস্পর পরিপূরক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদী দর্শন পড়তে হবে। কারণ, তাঁর মতে, প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শন পড়ালে তা ছাত্রদের কাছে পরস্পরবিরোধী ধারণা তুলে ধরবে, ফলে ছাত্ররা শিখবে— 'সত্য দু'রকম'। কাজেই এক ও অভিন্ন সত্য ধারণা গড়ে তুলতে হবে, ব্যালেন্টাইনের মতে, পরস্পর পরিপূরক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদী দর্শন পড়ানো উচিত। এই মতের বিরোধিতা করে ১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা এফ জে ময়েটকে লেখেন, "আমার বিশ্বাস, যে ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতো পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার সম্পর্কে এ রকম ভয় করার কোনও কারণ নেই। সত্যকার ধারণা একবার যে করতে পেরেছে তার কাছে সত্য সত্যই। 'সত্য দু'রকমের', এ রকমের ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছি, তাতে কোনও শিক্ষা থেকে ছাত্রদের মনে এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না।" তা হলে প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী দর্শন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তগুলি থেকে ছাত্রদের এক ও অভিন্ন সত্যোপলব্ধি গড়ে উঠবে কী করে? এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর যা লিখেছিলেন তা শুধু সে যুগে অভাবিত তাই নয়, আজও কথাটা অনেকেই মানতে পারেন না বা যাঁরা পারেনও, তাঁরা সাহসের সাথে বলতে দ্বিধা করেন। ব্যালেন্টাইনের চিঠির উত্তরে ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। ... কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা।"

'সাংখ্য এবং বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন'— প্রকাশ্যে এ কথা বলার মতো জ্ঞান ও সাহস সে যুগে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও ছিল না। এটাও লক্ষ করার বিষয় যে সাংখ্য ও বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য অনুসারে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু বিদ্যাসাগর দু'টিকেই ভ্রান্ত বলে একই পংক্তিতে স্থান দিয়েছিলেন। কারণ, পরস্পরবিরোধী হলেও দু'টির কোনওটিই বিজ্ঞানসম্মত নয়। সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য, বেদান্তের

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মাধ্যমিক পাশের মান অবনমনের প্রস্তাব
তীব্র বিরোধিতা এআইডিএসও-র

এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত সিলেবাস কমিটি সম্প্রতি সুপারিশ করেছে যে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে ৭টি বিষয়ের বদলে ইংরেজি ও গণিত সহ যে কোনও পাঁচটি পাশ করলেই চলবে। কেন্দ্রীয় বোর্ড বা সমতুল বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের সাথে মানের সামঞ্জস্য রক্ষার অজুহাতেই নাকি তাঁরা এই প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই প্রস্তাব অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষার স্বার্থের পরিপন্থী। ইতিমধ্যেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল না থাকার কারণে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। স্কুলছুট বাড়ছে এবং বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার রমরমা বাড়ছে। এরপর মাধ্যমিক পাশের নিয়মকে লঘু করা হলে তা ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশা ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে এবং শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের দাবি, ১) অবিলম্বে এই সুপারিশ বাতিল করা হোক, ২) শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও সুপারিশ কার্যকর করার আগে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত নেওয়া ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক, ৩) সরকারি বিদ্যালয়গুলির ভেঙে পড়া পরিকাঠামোয় ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের স্বীকৃত পদ্ধতি পাশ-ফেল ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণি থেকেই কার্যকর করার বিষয়ে সরকার দ্রুত অগ্রসর হোক।

দিল্লিতে সেভ এডুকেশন কমিটির নাগরিক সভা

২৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হলে ছাত্র স্বার্থবিরোধী 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯'-এর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে এক নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী প্রকাশ ভাই শাহ এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দিল্লির সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক গিরিবর সিং, গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক সারদা দীক্ষিত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক নন্দিতা নারায়ণ, অধ্যাপক সুবোধ শর্মা, জে এন ইউ-এর অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিংহ, সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে দেবাশিস রায় প্রমুখ। সম্মেলনের আগে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

জলপাইগুড়ি ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ

সম্প্রতি আসামে এনআরসি চালু করে ১৯ লক্ষ ভাষিক ও সংখ্যালঘু মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার। নাগরিকত্বহীন অসহায় মানুষের অবস্থা দেখে আতঙ্কিত দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ। এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবেই বলে বিজেপি নেতাদের হুমকি, পাশাপাশি ইভিপি ও ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান মানুষকে আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। এর জন্য জেলার সর্বত্র মাইক সহযোগে এবং হোর্ডিং মারফত প্রচার করা, ডিজিটাল রেশন কার্ডের কাজ রেশন দোকান মারফত বা পঞ্চায়েতে করা, ইভিপি-র কাজ বুথ লেভেল অফিসারের দ্বারা করা ইত্যাদি দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পার্থিব মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর

সাতের পাতার পর

মতো প্রাচ্য দর্শন নানা কারণে পাঠ্য হিসাবে রাখলেও ছাত্রদের মধ্যে এইসব ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর ইংরেজি পাঠ্যক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন পড়ানোর জন্য সুপারিশ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী দর্শনের দুই মূল স্তম্ভ সাংখ্য ও বেদান্তের ভ্রান্ত ধারণাগুলি তুলে ধরে, সত্য সম্পর্কে যুক্তিবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল-এর লজিক পড়াতে বললেন।

উল্লেখ্য, সে যুগে অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিরপেক্ষতা এতদূর ছিল যে সনাতনপন্থীদের দ্বারা বহুনিন্দিত চার্বাক দর্শনকে তিনি সর্বদর্শনসংগ্রহের প্রথম অধ্যায়ে স্থান দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে ভাববাদবিরোধী ও বেদবিরোধী চার্বাক দর্শনের আধুনিক চর্চার সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের হাতেই। (চলবে)

ভ্রম সংশোধন ঃ এই ধারাবাহিক রচনাটির ক্রম সংখ্যা, পত্রিকার ৭২ বর্ষ ১০ সংখ্যায় ভুলক্রমে '(১১)' ছাপা হয়েছে, যা হবে '(১২)'।

মিড-ডে মিল বেসরকারিকরণের কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

মিড-ডে মিল প্রকল্পকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিল প্রকল্পকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে সরকার বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবার নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেবে এবং মিড-ডে মিল প্রকল্প বেসরকারি সংস্থার লাভ করার ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। মুনাফার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে খাদ্যের গুণমান অবশ্যই কমে যাবে। এ ছাড়াও সারা দেশের লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্পের জন্য নির্মিত গৃহ, রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পে সারা দেশে ২৮ লক্ষাধিক কর্মী কাজ করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা কাজ হারাবেন।

আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে তা বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি। দাবি করছি, মিড-ডে মিল প্রকল্পকে আরও উন্নত করার জন্য ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বরাদ্দ করতে হবে এবং মিড-ডে মিল কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত মিড-ডে মিল কর্মী সহ সকল স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার জন্য এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আহ্বান করছি।

মিড-ডে মিল কর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ অক্টোবর কলকাতার ভারতসভা হলে। রাজ্যের সব জেলা থেকে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে মিড-ডে মিল কর্মীরা নিজেদের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিল প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পে রান্নার কাজে প্রচণ্ড আগুনের গরমে থেকে খাবার রান্না করা, পরিবেশন করা ও খাওয়া শেষে বাসন ধোয়া সহ সকল কাজই তাঁদের করতে হয়। বাজার করা, সব্জি কাটা, জল আনা সহ অন্য কাজও করতে হয়। খিদে পেলেও, ওখান থেকে খাওয়ার কোনও আইনসঙ্গত অধিকার তাঁদের নেই। গ্যাসে রান্নার সংস্থান থাকলেও, খরচ কমানোর জন্য এঁদের কাঠ দিয়ে রান্না করতে হয়।

এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও এঁরা পারিশ্রমিক পাই মাসে ১৫০০ টাকা। এই পারিশ্রমিকও পাওয়া যায় বছরে ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাস, বাকি দু'মাসের টাকা দেওয়া হয় না। এই সামান্য টাকাও নিয়মিত দেওয়া হয় না। কিন্তু হরিয়ানাতে এই পারিশ্রমিক দেওয়া হয় মাসে ৩৫০০ টাকা ও কেরলে মাসিক ৬৫০০ টাকা। এই কর্মীরা পি এফ, পেনশন সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত।

গত বছরে এবং এ বছরে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সামান্য বেতন বৃদ্ধি করলেও মিড-ডে মিল কর্মীদের ক্ষেত্রে কোনও সরকারই এক পয়সাও ভাতা বাড়ায়নি। এছাড়াও সংবাদে প্রকাশ যে, সমগ্র মিড-ডে মিল প্রকল্পকেই এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলস্বরূপ ত্রিপুরায় বহু বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে 'ইসকন' সংস্থার হাতে। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শুধু তাই নয়, মিড-ডে মিল প্রকল্পকে বন্ধের চক্রান্তও চলছে।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আন্দোলন জোরদার করেই জনস্বার্থবিরোধী এই সরকারগুলির কাছ থেকে দাবি আদায় করা সম্ভব। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড অশোক দাস। সম্মেলনে অশোক দাসকে উপদেষ্টা, সনাতন দাসকে সভাপতি, সুনন্দা পণ্ডাকে সম্পাদিকা, শ্যামল রামকে অফিস সম্পাদক করে ৪৩ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর'১৯ কলকাতায় হাজার হাজার মিড-ডে মিল কর্মীর বিক্ষোভ-সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এন আর সি বিরোধী
নাগরিক কনভেনশন
৪ নভেম্বর, মৌলালি যুব কেন্দ্র, কলকাতা, বিকাল ৩টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com